সদ্‌গুরু সান্নিধ্য

নারায়ণাশ্রম তপোবনম্

সূচীপত্র

সমর্পণ	iii
ভূমিকা	v
স্মৃতির পাতা থেকে	১
প্রথম দর্শনেই প্রেম	২১
বাবা – আমার আশ্রয়	৩১
ব্রহ্মবিদ্যার শাশ্বত ধারা	৪১
শেষ দর্শন	৫১
আমাদের গুরু-পরম্পরা	৫৫
বাবার লেখা চিঠি	৫৭
পূর্ণাশ্রম উদ্বোধনের প্রাক্-কাহিনী	৬৭
ছবি	৯৩-১০৪

প্রথম দর্শনেই প্রেম

স্বামী নির্বিশেষানন্দ তীর্থ

সত্যানুসন্ধান

আমার মনে হয় জন্ম থেকেই আমি সত্যান্বেষী। আমার যখন বছর পাঁচেক বয়স, তখন থেকেই আমার মনে পরম সত্যের চিন্তা জাগতো। বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধুসন্তরা মাঝে মাঝে জামশেদপুরে আসতেন। আমি একটু বড় হবার পর বাবা-মা আমাকে তাঁদের প্রবচন শুনতে নিয়ে যেতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি আধ্যাত্মিক বই পড়তে শুরু করলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'জ্ঞানযোগ' আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি যেখানেই যেতাম, এই ছোট্ট বইটি আমার সঙ্গে থাকতো।

বড় হয়ে আমি পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করা ঠিক করলাম। কিন্তু সে কেবল পরম সত্যকে জানবার জন্যেই। যে কোনও বিষয়কে বিশ্লেষণ করার এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আমার একটা নিজস্ব ধরণ ছিল। শ্লোক কণ্ঠস্থ করবার জন্যে অথবা শাস্ত্রে কী লেখা আছে, সেটা জানার জন্যে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তাম না। অল্পই পড়তাম আর তারপর সেটুকু নিয়ে ভাবতে থাকতাম, খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতাম কোনটা সত্যি আর কোনটা সত্যি নয়।

হয়তো আমার মনে একটা অহংকার এসেছিল যে পরম সত্য সম্বন্ধে আমার মনে একটা নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠেছে। খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ না করলেও, এইরকম একটা বিশ্বাস বা ভাব আমার মনে ছিল।

এমএসসি পাস করার পর আমি পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করতে শুরু

করলাম। গবেষণার বিষয় নির্ধারিত হওয়া অবধি হাতে খানিকটা সময় ছিল। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত সাংখ্য দর্শন বিষয়ক একটি বই আমার হাতে আসে। লেখক সাংখ্যযোগাচার্য স্বামী হরিহরানন্দ অরণ্য। আমি বইটি পড়তে শুরু করলাম।

এই বইটি মূলত পতঞ্জলি যোগসূত্র এবং তার টীকার ওপরে লেখা। মানুষের মনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ আর যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপনা আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করলো। পড়তে পড়তে আমি মগ্ন হয়ে গেলাম, কিন্তু আমার মনে হল যে এই বইয়ে প্রকাশিত মতভাব, বিশেষ করে সাধনার পথ, আমার ধারণার সাথে মিলছে না। আমার মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিল – কোন পথে এখন আমি চলবো?

যতদূর মনে পড়ে, বেশ কিছুদিন এই তীব্র দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে ছিল। তারপর আমার মনে হল শাস্ত্রে বলা আছে: "যখন মনে কোন দ্বন্দ্ব আসবে যা নিজের বিচার দ্বারা নিরসন করা যাচ্ছে না, তখন কোনও জ্ঞানী মহাত্মার শরণাপন্ন হওয়া উচিত।" প্রশ্নটা হল: জ্ঞানী কোথায় খুঁজে পাই?

পথনির্দেশের সন্ধানে

সাথে সাথেই আমার মনে পড়লো আমাদের স্বামীজীর কথা – স্বামী ভূমানন্দ তীর্থ। ১৯৬৬ সালে স্কুলের শেষ বছরে একবার তাঁর ভাষণ শুনেছিলাম। জামশেদপুরের গুজরাটি সনাতন সমাজে বেদান্তের উপর উনি প্রবচন দিচ্ছিলেন। সেই প্রবচনে স্বামীজী তাঁর গুরুদেব বাবা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা আমার হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল।

স্বামীজী মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর আমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, "স্বামীজী, কে এই বাবা?" আমার প্রশ্নের উত্তরে

স্বামীজী বাবার সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন। আমার মনে আছে সেই সময় তিনি বাবার গ্রামের নাম দক্ষিণখণ্ড, এ কথাটিও বলেছিলেন। স্বামীজী যেটুকু বলেছিলেন তার থেকে আমার মনে হয়েছিল যেন বাংলার এক সুদূর কোণে বসে এক ঋষি ব্রহ্মনিষ্ঠায় তপস্যা-মগ্ন। এই ভাবনাটা নিশ্চয়ই আমার মনের অন্তরালে কাজ করছিল। যখন সাধনার ব্যাপারে মনে দ্বন্দ্ব উঠলো, তখন আমার স্বামীজীর কথাগুলি মনে পড়লো। দক্ষিণখণ্ড তো কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়, দেড়শো কিলোমিটারের মতো।

একদিন সকালে আমি কাঁধের ঝোলায় এক সেট জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রেলষ্টেশনে গিয়ে খোঁজখবর নিলাম কোন ট্রেন যাবে, কোন ষ্টেশনে নামতে হবে। জানলাম, যে ষ্টেশনে আমাকে নামতে হবে, তার নাম ঝামটপুর বহরান। এই লাইনের অনেকগুলি জায়গা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার স্মৃতি বিজড়িত। খুব ঝরঝরে পুরানো একটি ট্রেনে এই যাত্রাটা ছিল একেবারেই অন্যরকম – অদ্ভুত এবং মজার। প্রায় আট ঘণ্টা ট্রেনযাত্রার পর ঝামটপুর বহরান ষ্টেশনে ট্রেন থামলো। ট্রেন থেকে নামতে হল লাফ দিয়ে, কারণ কোনও প্ল্যাটফর্ম ছিল না।

ট্রেন থেকে নামার সময় যে মুহূর্তে আমার পা দুটো ভূমি স্পর্শ করলো, মনে হল আমার চারপাশের পৃথিবী যেন পলকের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। কী গভীর শান্তি আমাকে ঘিরে! কখন যে ট্রেন ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেল, আমি যেন জানতেই পারলাম না। আজও সেদিনের সেই অনুভূতি জাগ্রত আছে।

একটা মস্ত বটগাছের নীচে একটা হ্যাণ্ডপাম্প। তার শীতল জলে হাত-মুখ ধুয়ে দক্ষিণখণ্ড গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। আমার পা দুটো যেন মাটি স্পর্শই করছেনা, আমি যেন হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছি। দু'পাশে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে মাটির রাস্তা। জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে ষ্টেশন থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে বাবার খড়ের

চাল দেওয়া মাটির কুটির 'পূর্ণাশ্রম'-এ পৌঁছলাম।

প্রথম দর্শনেই প্রেম

বাবার ঘরে ঢুকে দেখি একটা মস্ত বড় বাঘছালের উপর বাবা বসে আছেন। তাঁর অন্তর্ভেদী কিন্তু করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল যেন সময় থেমে গেছে, আমি ফিরে গেছি সেই উপনিষদের যুগে, দাঁড়িয়ে আছি এক ঋষির সামনে তাঁর আশ্রমে।

উনি কত মহান, উনি সত্যিই জ্ঞানী কিনা, উনি আমার গুরু হবেন কিনা, এমনকি আমার কোন গুরুর প্রয়োজন আছে কিনা – এই সব কোন প্রশ্নই আমার মনে জাগেনি। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম কী করে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সেই জিজ্ঞাসাও মন থেকে উধাও হয়ে গেল। অনুভব করলাম তাঁর প্রতি এক সহজ ভালবাসা – এক চিরন্তন প্রেম ও পরিচিতি।

খুব উজ্জ্বল চোখ ছিল বাবার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছো বাবা? আমার কাছে আজকাল কেউ তো বিশেষ আসে না!"

আমি বললাম, "স্বামী ভূমানন্দ তীর্থ আপনার কথা বলেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই আমি আপনার সম্বন্ধে জেনেছি।" আকর্ণবিস্তৃত হাসি নিয়ে বাবা বললেন, "ও! ভূমা! হ্যাঁ, ভূমা মাঝে মাঝে কিছু ভক্তকে আমার কাছে পাঠায় বটে।"

আধ্যাত্মিক গবেষণাগার

বাবা জানতে চাইলেন আমি তাঁর কাছে কেন এসেছি। পরম সত্য বিষয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা আমি তাঁকে জানালাম। আমি জানিনা হয়তো আমার কথাবার্তার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পেয়ে থাকবে। যেমন, "আমি কত ভেবেছি এসব নিয়ে, এ বিষয়ে আমার নিজস্ব

সিদ্ধান্ত আছে!" কিন্তু এটাও ঠিক যে আমার অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনা অকৃত্রিম ছিল এবং আমার জিজ্ঞাসায় বিনয়ের অভাব ছিল বলে মনে হয় না।

বাবা মন দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন। তারপর বললেন, "তুমি শাস্ত্র পড়ে যা শিখেছো, মহাত্মাদের কাছে যা শুনেছো বা নিজের মনে যা ভেবেছো, সবই ঠিক। কিন্তু তুমি তো পদার্থবিদ্যার ছাত্র। তুমি নিশ্চয়ই এটা বোঝ যে বিজ্ঞানের কোন নিয়ম বই পড়ে জানা আর পরীক্ষাগারে সেটা পরীক্ষা করে দেখা – এই দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে নেওয়াটাই শেষ কথা, এটা আমি বুঝি।"

বাবা বললেন, "দীক্ষার অর্থ তোমাকে এই আধ্যাত্মিক পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। পরীক্ষা দ্বারা তুমি নিজেই সত্য আবিষ্কার করতে পারবে – নিজের অন্তরের উপলব্ধি দ্বারা। দীক্ষা তোমাকে আত্ম-উপলব্ধির পথ ধরিয়ে দেবে। কিন্তু পথ চলতে হবে তোমাকেই।"

এতদিন অবধি আমি দীক্ষা নেওয়ার কথা কখনও ভাবিনি। হয়তো বাঙালী পরিবারের মধ্যে দীক্ষা নেওয়া খুবই প্রচলিত বলে আমি দীক্ষাকে বিশেষ মর্যাদা দিইনি। কিন্তু বাবা যে রকম বললেন, দীক্ষার অর্থ যদি আধ্যাত্মিক পরীক্ষাগারে প্রবেশ করা হয়, তাহলে সেটাই তো আমার এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। আমি বাবার কাছে বিদায় চাইলাম। বাবা বললেন, "সে কি! তুমি চলে যাবে? এক রাতও থাকবে না এখানে?" আমি বললাম, "আমার তো থাকতে খুব ইচ্ছে, কিন্তু আপনার অসুবিধা হবে না? আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে চাই না।" বাবার কথা শুনে সেই রাতটা পূর্ণাশ্রমেই থাকলাম।

বাবা – আমার আশ্রয়

মা গুরুপ্রিয়া

ভারমুক্তি

আমার তখন তেইশ বছর বয়স, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় রত। বাবা-মা, দুই ভাইকে নিয়ে আমাদের সুখী পরিবার। বাইরে থেকে দেখলে কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এক অনীহা আমার সমস্ত মনকে ভারাক্রান্ত করে থাকতো। পার্থিব জগতে সুখী হবার সব উপকরণ আমার নাগালে, তবু আমার মন দুঃখের ভারে অবসন্ন। জগতের সবকিছুই অনিত্য (ক্ষণস্থায়ী), এই ভাবনা আমার মন থেকে সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিয়েছিল। নিজেকে মাতৃহারা অসহায় শিশুর মত মনে হত। কখনও বা মনে হত যেন বিস্তীর্ণ এক জনহীন প্রান্তরের মধ্যে আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি, জানি না কোন পথে যেতে হবে।

এইরকম এক সময়ে আমি বাবার কথা জানতে পারলাম। সেই রাত্রিটা আমার এখনও মনে আছে। ঘুমের মধ্যে এক দৃশ্য দেখে আমি বারবার জেগে উঠছিলাম। যেন একটি বাড়ির উঠোনে শুভ্রশ্মশ্রু এক মহাত্মা তক্তপোষে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন আর তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে আমি অবিশ্রাম কেঁদে যাচ্ছি। মনে মনে ভাবছি, ইনিই কি বাবা!

সারা রাত্রি জেগে বসে রইলাম – দুই গাল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অনর্গল অশ্রুধারা। আমি কখনও জানতামই-না যে অশ্রুপাতের মধ্যে এত গভীর আনন্দ, এত শান্তি, এত নির্মলতা আছে। আমি যেন এত দিনে একটা আশ্রয়ের খোঁজ পেয়েছি।

বাবাকে আমি একটা চিঠি লিখলাম। আমার প্রথম চিঠি। একবারও

মনে হয়নি যে আমি একজন অজানা কাউকে লিখছি। মনে মনে নিশ্চিত ছিলাম যে উনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না, আশ্রয় দেবেন, পথ দেখাবেন। আমার মনের যত বোঝা, যত অসহায়তা – সব তাঁর চরণে সমর্পণ করলাম। তাঁকে মিনতি করলাম আমাকে পথ দেখাতে। প্রশ্ন করলাম গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া অপরিহার্য কিনা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বাবার উত্তর চলে এল। ছোট্ট চিঠি, আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা। চিঠি পড়ছি আর আমার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলেছে। শব্দগুলি, লাইনগুলি অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আন্তরিকতা, ভালবাসা আর উদ্বেগে ভরা সেই চিঠি। বাবা লিখলেন:

> ২৮.৬. ১৯৭৪
>
> মা গো,
>
> শিবাশীষ গ্রহণ করো। পত্রে তোমার অবস্থা জ্ঞাতে চিন্তিত। বিষয়ে দোষদর্শন ও বৈরাগ্য সৌভাগ্য না হলে হয় না। তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক আমি ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি।
>
> সব বিদ্যা শিখিতে তো গুরুকরণ করিতে হয় এটা তোমাদের জানা, আর যত দুশ্চিন্তাও এই সব চেয়ে যেটা বড় বিদ্যা তার জন্য? হ্যাঁ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। দীক্ষা ও গুরুকরণ দ্বারা বড়কে স্বীকার করা হয়, অহঙ্কার চূর্ণ হয়।
>
> যদি সময় সুযোগ পাও এসো। সাক্ষাতে সব শুনবো ও বলবো বা যতটুকু পারি সাহায্য করবো।
>
> আশীর্বাদ
>
> বাবা

(বাবার মূল চিঠির ছবি – পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪)

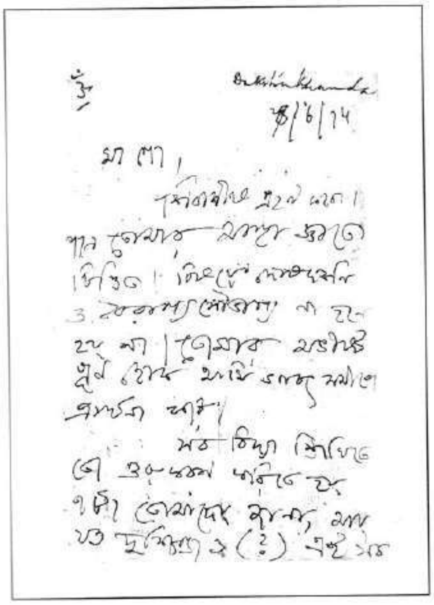

ওঁ

[illegible]

২৮/৬/৭৪

মা গো,

[illegible]

২৮.৬.১৯৭৪-এ রত্নদীপা (মা গুরুপ্রিয়া) কে লেখা
বাবার চিঠির ছবি (প্রথম পৃষ্ঠা)